জন্মের সময় নির্ধারণ:

সন্তানের জন্ম ও পরবর্তী গর্ভধারণের মধ্যে দু'বছরের ব্যবধান থাকলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। ১৮ বছরের আগে বা ৩৫ বছরের পরে গর্ভধারণ মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ। পুরুষ, মহিলা, এমনকী বয়ঃসন্ধির ছেলে-মেয়েদেরও পরিবার পরিকল্পনার সুফল সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। এর ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে সমস্ত তথ্য তাঁদের কাছে থাকবে।

১) আঠারো বছরের আগে বা ৩৫ বছরের পরে গর্ভধারণ মা ও শিশুর বিপদের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

২) শিশু ও নিজের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে শিশুর বয়স দু'বছর না হওয়া পর্যন্ত আবার গর্ভধারণ করা উচিত নয়।

৩) বার বার গর্ভধারণ করলে প্রসব ও গর্ভধারণের ঝুঁকি বাড়ে।

৪) কখন বাচ্চা হবে, ক'টি বাচ্চা হবে, দু'টি বাচ্চার মধ্যে কত বছরের ফারাক থাকবে এবং কখন থামবেন—পরিবার পরিকল্পনায় মা ও বাবাদের এ সব বিষয়েই জানান হয়। গর্ভধারণ রোধ করার বেশ কয়েকটি স্বীকৃত, সুরক্ষিত ও কার্যকরী উপায় আছে।

৫) পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব পুরুষ, মহিলা এবং বয়ঃসন্ধির ছেলে-মেয়েদের। স্বামী, স্ত্রী দু'জনকেই পরিবার পরিকল্পনার সুফল ও নানা সুযোগ সম্পর্কে জানতে হবে।

সুরক্ষিত মাতৃত্ব:

প্রসবের আগে ও পরে যত্ন পাওয়ার জন্য গর্ভবতী মহিলাদের প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছেই যাওয়া উচিত। প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্ত্বাবধানেই প্রসব করানো দরকার। প্রসবের আগে ও পরে নানা সমস্যার কথা গর্ভবতী মহিলা ও তাঁর পরিবারের জানা উচিত, যাতে বিপদে সহজে সাহায্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া প্রসবের সময়ে আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা করে রাখাও দরকার।

১) যে সব মহিলা শিক্ষিত, স্বাস্থ্য ভাল এবং যাঁরা শৈশব ও কৌশোরে পুষ্টিকর খাবার খেয়েছেন তাঁদের সুস্থ শিশুর জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাঁদের গর্ভধারণ ও প্রসবের সময়েও বিশেষ সমস্যা হয় না। বয়স অবশ্যই ১৮ বছরের বেশি হতে হবে।

২) গর্ভধারণের আগে মহিলা সুস্থ থাকলে এবং পুষ্টিকর খাদ্য খেলে মা ও শিশুর গর্ভধারণ সংক্রান্ত সমস্যার আশঙ্কা অনেক কমে যায়। ফোর্টিফায়েড খাদ্য এবং বাচ্চার মানসিক বিকাশের জন্য আয়োডিন যুক্ত লবন খাওয়া দরকার। গর্ভাবস্থা ও স্তনদানের সময়ে মায়েদের বেশি করে পুষ্টিকর খাবার, বেশি বিশ্রাম, আয়রন-ফোলিক অ্যাসিড এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস সাপ্লিমেন্ট দরকার।

৩) প্রতিটি গর্ভাবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার প্রসবের আগে অন্তত চার বার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। গর্ভবতী মহিলা ও তাঁর পরিবারের লোকজনের গর্ভাবস্থার নানা সমস্যার লক্ষণগুলি ঠিকমতো চিনে নেওয়া দরকার। যাতে সমস্যা হলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

৪) প্রসবের সময়, মা ও শিশুর পক্ষে সবচেয়ে সঙ্কটজনক সময়। তাই প্রসবের সময়ে দাই, নার্স, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসক সঙ্গে থাকা জরুরি। এতে কোনও সমস্যা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।

৫) প্রসবের পরে ঠিকমতো যত্ন নিলে মা ও শিশুর সমস্যা কম হবে। শিশুর সুস্থ জীবনের সূচনা হবে। জন্মের প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মা ও শিশুর প্রতি সর্বক্ষণ নজর রাখতে হবে। এর পরে জন্মের প্রথম সপ্তাহে এবং তার পরে ছয় সপ্তাহ বাদে বাদে শিশুকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কোনও সমস্যা থাকলে বার বার চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

৬) সুস্থ মা, সুরক্ষিত প্রসব, সদ্যজাতর প্রয়োজনীয় যত্ন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও পরিবারের ভালবাসা নবজাতকের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৭) ধূমপান, মদ্যপান, মাদকের নেশা, বিষাক্ত পদার্থ ও দূষণ ভ্রূণ ও শিশুর বেড়ে ওঠার পক্ষে ক্ষতিকারক।

৮) মহিলাদের প্রতি শারীরিক অত্যাচার জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। কয়েকটি জনগোষ্ঠীতে এই সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় শারীরিক অত্যাচার মা ও ভ্রূণের ক্ষতি করতে পারে। এতে গর্ভপাত, সময়ের আগে প্রসব ও কম ওজনের শিশুর জন্ম হতে পারে।

৯) কর্মক্ষেত্রে মা বা গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি বৈষম্য বন্ধ করতে হবে। মাকে স্তন্যপান করানোর বা দুধ বার করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। মহিলাদের মাতৃত্বকালীন অবকাশ, চাকরির সুরক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ ও সম্ভব হলে অর্থ সাহায্য করাও দরকার।

১০) প্রতিটি মহিলার স্বাস্থ্যের অধিকার আছে। বিশেষ করে গর্ভবতী ও সদ্য মায়েদের। যাঁরা যত্ন নেবেন, তাঁদের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। প্রচলিত নানা প্রথার বিষয়েও তাঁদের সংবেদনশীল হতে হবে। তা ছাড়া মহিলা ও বয়ঃসন্ধির মেয়েদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে।

শিশুর বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষা:

শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই শিখতে শুরু করে। ঠিকমতো স্নেহ, নজর ও অনুপ্রেরণা পেলে তারা দ্রুত বুঝতে শেখে ও বেড়ে ওঠে। এর সঙ্গেই দরকার পুষ্টিকর খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগ। ছেলে-মেয়েদের একই ভাবে চারপাশ চেনা, নিজেকে বোঝা ও খেলাধুলো করার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। এতে তাদের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক উন্নতি হয় এবং সামাজিক মেলামেশার ক্ষমতা বাড়ে।

১) প্রথম তিন বছর শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে সে যা দেখে, ছোঁয়, চাখে, গন্ধ নেয় বা শোনে সবই তার চিন্তা, অনুভব, চলাফেরা ও শেখায় প্রভাব ফেলে।

২) জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু শিখতে শুরু করে। মা-বাবা বা অন্যান্যদের ঠিকমতো স্নেহ, ভালবাস ও উৎসাহ পেলে তারা দ্রুত শেখে। এর সঙ্গেই দরকার পুষ্টিকর খাদ্য ও চিকিৎসার সুযোগ।

৩) নিজেদের মতো করে খেলতে ও শিখতে শিশুদের উৎসাহ দিলে তাদের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক উন্নতি হয় এবং সামাজিক মেলামেশার ক্ষমতা বাড়ে। এতে তারা স্কুলের যাওয়ার জন্যও তৈরি হয়ে যায়।

৪) কাছের মানুষের আচরণ নকল করেই বাচ্চারা আচরণ করতে শেখে।

৫) ঠিক সময়ে স্কুলে ভর্তি হওয়া বাচ্চার বিকাশের পক্ষে জরুরি। মা-বাবা, শিক্ষক ও অন্যান্য স্নেহভাজনদের সাহায্যও দরকারি।

৬) প্রতিটি শিশুর বিকাশের ধরন এক হলেও বিকাশের গতি আলাদা হয়। প্রত্যেক শিশুর রুচি, স্বভাব, আকর্ষণ ও সামাজিক মেলামেশার ধরন আলাদা হয়।

স্তন্যপান:

কেবলমাত্র মায়ের দুধই ছ'মাস পর্যন্ত শিশুর পক্ষে উপযুক্ত আহার৷ ছ'মাসের পরে মায়ের দুধের সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার পরে৷ বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য দু'বছরের পরেও শিশু মায়ের দুধ পান করতে পারে৷

১) জন্মের পরে প্রথম ছ'মাস শিশুকে মায়ের দুধই খাওয়াতে হবে৷ এ সময়ে অন্য কোনও খাবার, এমনকী জলেরও প্রয়োজন নেই৷

২) জন্মের কিছু ক্ষণের মধ্যেই শিশুকে মায়ের কোলে দিতে হবে৷ সদ্যজাতের মায়ের শরীরের সংস্পর্শেই থাকা উচিত৷ জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে স্তন্যপান শুরু করানো উচিত৷

৩) সব মায়ই ঠিকমতো স্তন্যপান করাতে পারেন৷ শিশুকে বার বার স্তন্যপান করালে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়৷ সদ্যজাতকে দিন, রাত মিলিয়ে অন্তত ৮বার স্তন্যপান করাতে হবে৷ তা ছাড়া খিদে পেলেও দুধ খাওয়াতে হবে৷

৪) স্তন্যপান শিশুকে কয়েকটি রোগের থেকে রক্ষা করে৷ এতে মা ও শিশুর আত্মীয়তাও গড়ে ওঠে৷

৫) স্তন্যপানের বদলে কোন প্রাণীর দুধ বা কৌটোর দুধ বোতলে করে পান করালে শিশুর ক্ষতি হতে পারে৷ মা শিশুকে স্তন্যপান করাতে না পারলে আলাদা ভাবে মায়ের দুধ বার করে বা মায়ের দুধের উপযুক্ত বিকল্প দুধ পরিষ্কার পাত্রে নিয়ে শিশুকে পান করাতে হবে৷

৬) মা এইচআইভি পিজিটিভ হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে৷ শিশু প্রথম ছ'মাস মায়ের দুধের সঙ্গে বিকল্প খাবার খেলে সংক্রমণের আশঙ্কা আরও বাড়ে৷ তাই যত দিন না সময়, সুযোগ ও সুলভ হচ্ছে তত দিন বিকল্প খাবার দেওয়া উচিত নয়৷

৭) কর্মরত মা শিশুর কাছে থাকলে স্তন্যপান করাবেন৷ বাড়ির বাইরে থাকলে দুধ বার করে রেখে যাবেন৷ অন্য কেউ শিশুকে খাইয়ে দেবেন৷

৮) ছ'মাস পরে শিশু বাইরের খাবার খাওয়া শুরু করলেও স্তন্যপান চালিয়ে যাওয়া উচিত। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যপান করানো যায়। শিশুর পুষ্টি, শক্তি ও রোগ প্রতিরোধের জন্য স্তন্যপান চালিয়ে যাওয়া জরুরি।

পুষ্টি ও বৃদ্ধি:

গর্ভাবস্থা ও প্রথম দু’বছর পুষ্টির অভাব শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক। শিশুকে সুষম আহার দিতে হবে। এতে প্রোটিন, ভিটামিনের পাশাপাশি শক্তি সমৃদ্ধ খাবার ও খনিজ পদার্থ থাকতে হবে। বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য লোহা ও ভিটামিন-এয়ের প্রয়োজন আছে। জন্মের প্রথম বছরে প্রতি মাসে বাচ্চার ওজন নেওয়া দরকার। পরের বছর থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর বাচ্চার ওজন নিতে হবে। যদি বাচ্চার ওজন ঠিকমতো না বাড়ে তবে ডাক্তার দেখাতে হবে।

১) শিশুদের দ্রুত ওজন বাড়ে। তাই প্রথম দু’বছর নিয়মিত শিশুদের ওজন নেওয়া দরকার। যদি দেখা যায় ওজন ঠিকমতো বাড়ছে না তখন স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

২) জন্মের পরে প্রথম ছ’মাস শিশু শুধু স্তন্যপান করবে। এর পরে স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। এতে শিশুর ঠিকমতো বিকাশ ও বৃদ্ধি হবে।

৩) ৬ থেকে ৮ মাস পর্যন্ত শিশু দিনে দু’ থেকে তিন বার খাবে। ৯ মাসের পর থেকে শিশু দিনে ৩ থেকে

৪) বার খাবে। এর সঙ্গে স্তন্যপানও চালিয়ে যেতে হবে। শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী দু’টি খাবারের মাঝে ফল, রুটি, বাদামের গুঁড়োও দেওয়া যেতে পারে। অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে। খাবারের বৈচিত্র ও গুণমান ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে।

৫) খাওয়ার সময় ভালবাসা, কথোপকথন ও শেখার সময়। এতে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকতার বিকাশ হয়। শিশুকে খাওয়ানোর সময়ে শিশুর সঙ্গে কথা বলা উচিত। এ ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য করা উচিত নয়।

৬) শিশুদের জন্য ভিটামিন-এ খুবই দরকারি। নানা ধরনের রোগ প্রতিরোধ করতে, দৃষ্টি শক্তি বাড়াতে ও মৃত্যুহার কমাতেও ভিটামিন-এ প্রয়োজন। ফল, সব্জি, তেল, ডিম, লিভার, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদিতে ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। যে সব অঞ্চলে ভিটামিন-এয়ের অভাব রয়েছে সেখানে ছ’মাস অন্তর, ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুকে ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্ট খাওয়াতে হবে।

৭) শারীরিক ও মানসিক স্বক্ষমতার জন্য ও রক্তাল্পতার থেকে বাঁচাতে শিশুদের লোহার প্রয়োজন। মেটে, চর্বি ছাড়া মাংস, মাছ, ডিম ইত্যাদিতে লোহা রয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজন পড়লে লোহা সম্বৃদ্ধ খাবার ও সাপ্লিমেন্ট দেওয়া যেতে পারে।

৮) শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য আয়োডিন প্রয়োজন। শেখার অসুবিধা দূর করতে ও বিকাশে গতি আনতেও আয়োডিন প্রয়োজন। এর জন্য গর্ভাবস্থা থেকে মাকে এবং পরে শিশুকে সাধারণ নুনের পরিবর্তে আয়োডিন যুক্ত নুন খাওয়াতে হবে।

৯) শিশুর খাদ্য ও পানীয়ের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরিয়ার আশঙ্কাও বাড়ে। খাবারে থাকা জীবানু ও দূষিত পদার্থের জন্য ডায়েরিয়া হয়। এর ফলে দেহে পুষ্টি ও শক্তির অভাব দেখা দেয়। বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়। এর থেকে বাঁচতে পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধ জল, ঠিকমতো খাদ্য সংরক্ষণ ও শিশুর খাদ্য তৈরিতে নজর দিতে হবে।

১০) কোনও অসুখ করলে শিশুকে বেশি করে জল খাওয়াতে হবে। সাধারণ খাবারও ঠিকমতো খাওয়াতে হবে। শিশু স্তন্যপান করলে বেশি করে স্তন্যপান করানো দরকার। অসুখ সারলে বেশি করে খাওয়াতে হবে। কারণ, অসুখের সময়ে শরীরে পুষ্টির খামতি হয়।

১১) খুব রোগা বা ফুলে যাওয়া শিশুদের পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। তাদের স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

টীকাকরণ:

প্রত্যেক শিশুর সব ক'টি টীকা নেওয়া উচিত। বিশেষ করে প্রথম দু'বছর বয়সের টীকাগুলি শিশুকে নানা রোগের থেকে রক্ষা করে। মা হতে পারেন এমন মহিলা এবং বয়ঃসন্ধির মেয়েদের টিটেনাসের টীকা নেওয়া দরকার। এতে নিজের সুরক্ষার পাশাপাশি ভ্রূণও সুরক্ষিত থাকবে। জীবনে পাঁচ বার টিটেনাসের টীকা নিতে হয়। আগে নেওয়া না থাকলে গর্ভাবস্থায় টিটেনাসের বুস্টার ডোজ নিতে হবে।

১) টীকাকরণ জরুরি। শিশুকে সব ক'টি টীকাই নিতে হবে। বিশেষ করে এক বছর এবং দু'বছর বয়সের টীকাগুলি খুবই জরুরি। মা-বাবা ও অভিভাবকদের এ বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

২) টীকা বাচ্চাকে নানা রোগের থেকে রক্ষা করে। টীকা না দিলে শিশু অসুস্থ, পঙ্গু ও অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

৩) শিশুর হাল্কা কোনও অসুখ হলে, কোনও অক্ষমতা থাকলে কিংবা অপুষ্টিতে ভুগলেও টীকা দিতে বাধা নেই।

৪) মা ও সদ্যজাতকে টিটেনাসের থেকে রক্ষা করতে হবে। মা আগে টিটেনাসের টীকা নিলেও, স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে কথা বলে আবার টিটেনাসের টীকা নেওয়া দরকার কি না জানতে হবে।

৫) প্রত্যেকটি টীকা দেওয়ার সময় নতুন সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকটি টীকা নেওয়ার সময়ে আপনি নতুন সিরিঞ্জ দাবি করতে পারেন।

৬) ভিড়ের মধ্যে বা ঘিঞ্জি এলাকায় দ্রুত অসুখ ছড়িয়ে পড়ে। তাই ঘিঞ্জি এলাকায় থাকা, শরণার্থী শিবিরে থাকা, বা প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্ত এলাকার শিশুদের দ্রুত টীকা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে হামের টীকায় গুরুত্ব দিতে হবে।

৭) টীকা নেওয়ার আগে স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে টীকা নেওয়ার কার্ড দেখাতে হবে।

ডায়েরিয়া বা দাস্ত:

ডায়েরিয়া হলে শিশুকে প্রচুর পরিমাণে জল পান করাতে হবে। বয়স ছ'মাসের কম হলে বার বার স্তন্যপান ও ওআরএস (ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট) দিতে হবে। বয়স ছ'মাসের বেশি হলে নানা ধরনের পুষ্টিকর তরল খাওয়ানো যেতে পারে। ডায়েরিয়ার মাত্রা কমানোর জন্য জিঙ্ক দেওয়া যেতে পারে। মলে রক্তের ছিটে থাকলে এবং বার বার হতে থাকলে শিশুর বিপদ হতে পারে। দ্রুত শিশুকে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

১) ডায়েরিয়ায় শরীরে জলের পরিমাণ কমে গিয়ে শিশুর মৃত্যু হতে পারে। ডায়েরিয়া শুরু হলেই শিশুকে বেশি করে তরল এবং নিয়মমতো খাবার দিতে হবে।

২) বাচ্চা এক ঘণ্টার মধ্যে বার বার জলের মতো মলত্যাগ করলে এবং মলে রক্তের ছিটে থাকলে দ্রুত স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৩) ছ'মাস পর্যন্ত শুধু স্তন্যপান এবং ছ'মাস পরেও নিয়মিত স্তন্যপান ডায়েরিয়ার থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারে। রোটা ভাইরাসের টীকা (যেখানে দরকারি) এই ভাইরাসের থেকে ডায়েরিয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। এ ছাড়াও জিঙ্ক ও ভিটামিন-এ-র সাপ্লিমেন্টও ডায়েরিয়ার ঝুঁকি কমায়।

৪) বাচ্চার ডায়েরিয়া হলেও তাকে নিয়মমতো খাইয়ে যেতে হবে। অসুখ সারার পরে পুষ্টি ও শক্তি ফিরে পেতে বেশি করে খাওয়াতে হবে।

৫) ডায়েরিয়া হলে ১০ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত শিশুকে ওআরএস ও জিঙ্ক সাপ্লিমেন্ট খাওয়াতে হবে। ডায়েরিয়ায় ওষুধ বিশেষ কাজ করে না। ক্ষতিও করতে পারে।

৬) ডায়েরিয়ার থেকে বাঁচতে শিশুদের মল, শৌচাগারে ঠিকমতো ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে।

৭) পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধ পানীয়, ডায়েরিয়ার থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়। শিশুদের মল পরিষ্কার করার পরে বা খাবার তৈরির আগে হাত ভাল করে সাবান বা ছাই দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

কাশি, সর্দি ও অন্য কঠিন অসুখ:

সর্দি, কাশিতে ভুগলে অধিকাংশ বাচ্চা নিজে থেকেই সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু সর্দি ও জ্বরে আক্রান্ত কোনও শিশুর যদি শ্বাসকষ্ট হয় বা দ্রুত শ্বাস নেয় তবে তাকে স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে নিয়ে যেতে হবে।

১) সর্দি কাশি হলে উষ্ণ পরিবেশে শিশুকে রাখতে হবে। যতটা পারে খাদ্য ও পানীয় খাওয়াতে হবে।

২) কোনও কোনও সময়ে সর্দি থেকে জটিল অসুখ করতে পারে। সর্দি, জ্বর ও দ্রুত নিশ্বাস নিলে শিশুর নিউমনিয়া বা ফুসফুসে সংক্রমণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে দ্রুত স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে নিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মী তাকে রেফার করে দেবেন।

৩) ছ'মাস শুধু স্তন্যপান করালে শিশুর নিউমনিয়ার আশঙ্কা কমে। ঠিকমতো টীকা ও পুষ্টিকর খাবার দিলেও শিশুর নিউমনিয়ার আশঙ্কা কমে।

৪) শিশুর তিন সপ্তাহের বেশি কাশি হতে থাকলে দ্রুত স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে নিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে টিবির আশঙ্কা থাকে।

৫) গর্ভবতী মা ও শিশু তামাক বা উনুনের ধোঁয়ায় থাকলে নিউমনিয়া বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

পরিচ্ছন্নতা:

পরিচ্ছন্ন থাকলে অনেক রোগ এড়ানো যায়। বাচ্চার মল বা বাচ্চাকে পরিষ্কার করানোর পরে সাবান দিয়ে (সাবান না থাকলে ছাই দিয়ে) হাত ধুতে হবে। পরিষ্কার শৌচালয় ব্যবহার করতে হবে। শিশুর মলকে শিশুর থাকার বা খেলার জায়গা থেকে দূরে ফেলে দিতে হবে। খাবার বা পানীয় জল ধরার আগে হাত ধুতে হবে। পানীয় জলকে পরিশোধন করে নিলে বা শুদ্ধ উৎস থেকে পানীয় জল নিলে অনেক রোগের থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১) শিশু ও বাড়ন্ত বাচ্চাদের মল ঠিকমতো পরিষ্কার করতে হবে। বাড়িতে শৌচালয় থাকলে সেখানেই মল ফেলতে হবে। নয়তো মল মাটি চাপা দিতে হবে।

২) মলের সংস্পর্শে এলে, খাবার বা পানীয় জল ধরার আগে বা শিশুকে খাওয়ানোর আগে হাত সাবান দিয়ে ভাল করে ধুতে হবে। সাবান না থাকলে ছাই ও জল ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩) প্রতি দিন হাত ও মুখ সাবান দিয়ে ধুলে চোখের সংক্রমণ হয় না। চোখের সংক্রমণ থেকে **ট্রাকোমা** হতে পার। শিশু অন্ধও হয়ে যেতে পারে।

৪) পানের ও ব্যবহারের জল ঠিক উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বাইরে ও ভিতরে ভাল করে পরিষ্কার করে পাত্রে জল রাখতে হবে। পাত্রের মুখ ঢেকে রাখতে হবে। দরকার পরলে জল ফুটিয়ে, ফিল্টার করে, ক্লোরিন দিয়ে, সূর্যের আলোয় রেখে জীবানু নষ্ট করে পান করতে হবে।

৫) কাঁচা বা বাসি রান্না খুব বিপজ্জনক। কাঁচা জিনিস ধুঁয়ে ঠিকমতো রান্না করতে হবে। বাসি রান্নাকে বেশি ফেলে না রেখে গরম করে খেতে হবে।

৬) কাঁচা সব্জি, বাসনপত্র ও রান্নার জায়গা পরিষ্কার রাখতে হবে। গৃহপালিত পশুদের থেকে খাদ্যদ্রব্য দূরে রাখতে হবে। পাত্র ঢেকে রাখতে হবে।

৭)বাড়ির সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার থাকলে অসুখের আশঙ্কা কমে।

৮) মাসিকের সময়ে পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি। মহিলাদের গোপনাঙ্গ পরিষ্কার রাখতে হবে। এ সময়ে কাপড় পরিষ্কার ও শুকনো রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত। মহিলা ও বয়ঃসন্ধির মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করা উচিত। বাড়ির অন্য সব জঞ্জালের মতোই স্যানিটারি ন্যাপকিন ফেলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ম্যালেরিয়া:

মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায়। ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুও হতে পারে। যেখানে ম্যালেরিয়া হচ্ছে সেখানে কীটনাশক দেওয়া মশারি মধ্যে ঘুমনো উচিত। বাচ্চার জ্বর হলে স্বাস্থ্যকর্মী দেখাতে হবে। শিশুকে হাল্কা ঠান্ডা জলে স্পঞ্জ করিয়ে দিতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ মতো গর্ভবতী মহিলারা অ্যান্টি-ম্যালেরিয়ার ট্যাবলেট খাবেন।

১) মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া ছড়ায়। তাই ঘুমনোর সময়ে কীটনাশক দেওয়া মশারি ব্যবহার করা দরকার।

২) ম্যালেরিয়া হলে শিশুদের বিপদ। শিশুর জ্বর হলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ম্যালেরিয়া পাওয়া গেলে অ্যান্টি-ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেতে হবে। হু-র মতে প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম থেকে ম্যালিরিয়া হলে আর্টিমিসিনিন বেসড কম্বিনেশন থেরাপি (এসিটি)তে চিকিৎসা করানো উচিত।

৩) গর্ভবতী মহিলাদের পক্ষে ম্যালেরিয়া খুবই ক্ষতিকারক। বাড়ির আশেপাশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া ট্যাবলেট খেতে হবে। মশারি ব্যবহার করতে হবে।

৪) বাচ্চাদের ম্যালেরিয়া হলে বা সারার সময়ে বেশি করে তরল ও খাবার দিতে হবে।

এইচআইভি

এইচআইভি ভাইরাস থেকে এড্‌স হয়। এই রোগ সংক্রমণ আটকানো ও চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু এই রোগের নিরাময় সম্ভব নয়। এড্‌স হয়েছে এমন কারোর সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, এড্‌স আক্রান্ত মায়ের থেকে গর্ভস্থ সন্তান বা সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর সময়ে, এইচআইভি সংক্রমিত সিরিঞ্জ, সূচ থেকে এবং রক্তের মাধ্যমে এড্‌স ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমেই এই বিষয়ে জানা দরকার। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বৈষম্য ও কলঙ্ক দূর করা দরকার। রোগটি দ্রুত ধরতে পারলে এবং ঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু হলে বাচ্চা ও বড়রা বেশি দিন সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারে। এড্‌স আক্রান্ত শিশু ও তার পরিবারের সব ধরনের সেবা ও যত্ন পাওয়া দরকার। তাঁদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধেও জানতে হবে।

১) এইচআইভি ভাইরাস থেকে এড্‌স হয়। এই রোগ সংক্রমণ আটাকান ও চিকিৎসা করানো যায়। কিন্তু এই রোগের নিরাময় সম্ভব নয়। এড্‌স ছড়ায় ১) এড্‌স হয়েছে এমন কারও সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক করলে, ২) এড্‌স আক্রান্ত মায়ের থেকে গর্ভস্থ সন্তান বা সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর সময়ে, ৩) সংক্রমিত সিরিঞ্জ, সূচ থেকে এবং রক্তের মাধ্যমে এড্‌স ছড়িয়ে পড়ে। এড্‌স আক্রান্তের সংস্পর্শে এলে এড্‌স ছড়ায় না।

২) এড্‌স সম্পর্কে জানাতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে বা এড্‌স সেন্টারে যেতে হবে। সেখানে এইচআইভি-র পরীক্ষা, কাউন্সিলিং, যত্ন ও সাহায্য সম্পর্কে জানা যাবে।

৩) গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে এড্‌স সম্পর্কে জানতে হবে। যাঁদের পরিবারের কারও বা স্বামীর এড্‌স হয়েছে বা অন্য কোনও ভাবে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে তাঁদের এইচআইভি-র পরীক্ষা করানো জরুরি। এড্‌স হলে কী ভাবে নিজের ও সন্তানের যত্ন নিতে হবে তা-ও জানতে হবে।

৪) যে সব শিশুর বাবা বা মা এড্‌স আক্রান্ত বা এইচআইভি সংক্রমণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাদের এইচআইভি-র পরীক্ষা করাতে হবে। চিকিৎসা ও যত্নের ব্যবস্থাও করতে হবে। স্নেহ, ভালবাসার যেন অভাব না হয়।

৫) মা-বাবার কী ভাবে এড্‌স ছড়িয়ে পড়ে তা নিয়ে সন্তানদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। মেয়ে ও কমবয়সী মহিলারা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েন। কী ভাবে যৌন হয়রানি, হিংসা ও চাপের থেকে নিজেদের বাঁচাতে হয় তা ছোটদের শেখাতে হবে। এ ছাড়াও সম্পর্ককে সম্মান দেওয়া ও বৈষম্য না করতেও শেখাতে হবে।

৬) মা-বাবা, শিক্ষক ও অভিভাবকরা বয়ঃসন্ধির ছেলে-মেয়েদের সুস্থ ও সুরক্ষিত পরিবেশে বেড়ে উঠতে দেবেন। যাতে তারা সুস্থ জীবন বেছে নিতে পারে।

৭) কী ভাবে এইচআইভি আটকানো যায়, কী ভাবে আক্রান্তের যত্ন নিতে হয়, কী ভাবে সাহায্য করতে হয়—সবই ছোট ও বয়ঃসন্ধির ছেলে-মেয়েদের শেখাতে হবে।

৮) এইচআইভি আক্রান্তের পরিবারের অর্থ ও নানা ধরনের সামাজিক সাহায্য দরকার। এই সমস্ত পরিবারকে সাহায্য পাওয়ার উপায় জানাতে হবে।

৯) এইচআইভি আক্রান্ত শিশু ও বড়দের কোনও ভাবে কলঙ্কিত না করা ও বৈষম্য বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের বড় ভূমিকা আছে।

১০) এইচআইভি আক্রান্তের নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

শিশুর সুরক্ষা:

কন্যা ও পুত্র সন্তানকে পরিবার, স্কুল ও সমাজে সমান সুরক্ষা দিতে হবে৷ সুরক্ষা না থাকলে শিশুদের বিরুদ্ধে সহজেই হিংসা, খারাপ ব্যবহার, যৌন হয়রানি ও বৈষম্য হয়৷ পাচার ও শিশুশ্রম বড় সমস্যা৷ শিশুকে পরিবারের সঙ্গে রাখতে হবে৷ জন্মের রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে৷ সুরক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সুবিধা ও অপরাধ করলে আলাদা বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে৷ শিশুকে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে তারা কোন আচরণের প্রতিবাদ করতে পারে৷ শিশুকে সুস্থ পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার অধিকার দিতে হবে৷

১) প্রত্যেক শিশুর পরিবারের মধ্যেই বেড়ে ওঠা উচিত৷ পরিবার যত্ন না নিলে প্রশাসনের নজর দেওয়া দরকার৷ পরিবার যাতে ভেঙে না যায় তা-ও দেখতে হবে৷

২) প্রত্যেক শিশুর নাম ও নাগরিকত্বের অধিকার রয়েছে৷ জন্মের রেজিস্ট্রেশন করালে শিশু শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আইনি ও সামাজিক সুরক্ষার অধিকার পাবে৷ শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসা ও হয়রানি বন্ধ করার জন্য জন্মের রেজিস্ট্রেশন প্রথম পদক্ষেপ৷

৩) কন্যা ও পুত্র সন্তানকে সব ধরনের হিংসা ও হয়রানি থেকে রক্ষা করতে হবে৷ বিশেষ করে যৌন ও মানসিক হয়রানি, অবহেলা, বালিকা বয়সে বিয়ে, যৌনাঙ্গের ক্ষতি করার মতো বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে৷ পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে হবে৷

৪) ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ শিশুদের করতে দেওয়া যাবে না৷ কাজ কখনই যেন তাদের স্কুলের বাধা হয়ে না দাঁড়ায়৷ শিশু শ্রম, জোর করে কাজ করানো, মাদক পাচারের থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে৷

৫) বাড়ি, স্কুল ও অন্যান্য নানা জায়গায় শিশুরা হয়রানির শিকার হতে পারে৷ এই হয়রানি বন্ধ করতে হবে৷ হয়রানি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে৷

৬) অরক্ষিত শিশুরা পাচারের শিকার হয়। সরকার, সুশীল সমাজ ও পরিবারকে শিশু পাচার বন্ধ করতে উদ্যোগী হতে হবে। কোনও শিশু পাচার হলে তাকে নিজের পরিবার ও সমাজের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) শিশুর অধিকারে উপরে শিশুর বিচার নির্ভর করে। শিশুর অধিকার হরণ না করাই উচিত। হিংসায় আক্রান্ত বা সাক্ষী শিশুর প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে।

৮) শিশুকে পরিবারের সঙ্গে রাখতে, স্কুলে যেতে ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পেতে অর্থ সাহায্যও করতে হবে।

৯) শিশুকে বয়সের পক্ষে উপযুক্ত তথ্য জানাতে হবে, যাতে নানা হয়রানি ও হিংসার বিরুদ্ধে নিজেই প্রতিবাদ করতে পারেন। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে তার মতামতকেও গুরুত্ব দিলে সে দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠবে।

চোট থেকে রক্ষা:

শিশুদের অনেক সময়ে মারাত্মক আঘাত লাগে। গুরুতর আঘাত লাগলে শিশু পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুও হতে পারে। এ জন্য মা-বাবা ও অভিভাবকদের শিশুর চারপাশ সুরক্ষিত রাখতে হবে।

১) মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্যরা শিশুকে ঠিকমতো নজরে রাখলেই অনেক চোট-আঘাত থেকে বাঁচানো যায়। তার চারপাশ সুরক্ষিতও রাখতে হবে।

২) রাস্তায় শিশুদের বিপদ হতে পারে। তাদের রাস্তার ধারে খেলতে দেওয়া উচিত নয়। রাস্তা পার হওয়ার সময়ে তাদের সঙ্গে বড়দের থাকা দরকার। দু'চাকার গাড়িতে যাওয়ার সময় মাথায় হেলমেট ও চার চাকার গাড়িতে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) বাচ্চারা অল্প জলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ডুবে যেতে পারে। এমনকী বাথটবেও বিপদ হতে পারে। জলের কাছে বাচ্চাদের একা ছাড়া উচিত নয়।

৪) আগুনে পোড়া থেকে বাঁচাতে শিশুদের কোনও ধরনের আগুন, গ্যাস, গরম তরল বা খাবার ও খোলা তারের কাছাকাছি যেতে দেওয়া যাবে না।

৫) পড়ে গিয়ে শিশুদের চোট লাগে। সিঁড়ি, ব্যালকনি, ছাদ, জানালা এবং খেলার জায়গায় শিশুরা যাতে পরে না যায় তা লক্ষ রাখতে হবে। ঘুমোনোর জায়গাও চার পাশ ঘিরে দিতে হবে।

৬) ওষুধ বিষ, কীটনাশক, ব্লিচ, অ্যাসিড, সার, কেরোসিনের মতো জ্বালানি শিশুর থেকে দূরে রাখতে হবে। আলাদা পাত্রে চিহ্ন দিয়ে এ সব রাখতে হবে। এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে বাচ্চারা লক খুলতে না পারে।

৭) কাঁচি, ছুরি ও অন্যান্য ধারালো জিনিস যেন বাচ্চার নাগালে না থাকে। ভুল করে প্লাস্টিক ব্যাগে বাচ্চার দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই এই ধরনের ব্যাগ সরিয়ে রাখা দরকার।

৮) বাচ্চারা এটা-সেটা মুখে দেয়। তাই কয়েন, নাট, বোতাম বাচ্চাদের থেকে দূরে রাখতে হবে। বাচ্চাদের খাবার ছোট করে কাটতে হবে যাতে তারা সহজে চিবাতে ও গিলতে পারে।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি:

পরিবার ও আশেপাশের লোকজনদের জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংঘর্ষ, মহামারীর মতো দুর্ঘটনা যে কোনও সময়েই ঘটতে পারে। এমন অবস্থায় মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টিকর খাদ্য, স্তন্যপানের সুবিধা, হিংসা, হয়রানি ও শোষণ থেকে রক্ষার দিকে প্রথমে নজর দিতে হবে। বাচ্চারা যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিত পরিবেশে পড়াশোনা ও খেলাধুলো করতে পারে তা দেখতে হবে। শিশুরা যাতে সুরক্ষিত বোধ করে তা-ও লক্ষ করতে হবে।

১) যে কোন জরুরি পরিস্থিতিতেও শিশুদের অধিকার হরণ করা যায় না।

২) স্কুলে বা বাড়িতে দুর্যোগের সময়ে কী করতে হবে সে সম্পর্কে মা-বাবা ও পরিবারকে আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখতে হবে।

৩) হাম, ডায়েরিয়া, নিউমনিয়া, ম্যালেরিয়া, অপুষ্টি ও প্রসব পরবর্তী সমস্যা শিশুর মৃত্যুর অন্যতম কারণ। এগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

৪) মহামারী প্রবল হয়ে জরুরি অবস্থা তৈরি করতে পারে। কয়েকটি ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রে রোগীকে আলাদা ভাবে রাখতে হয়।

৫) মা জরুরি অবস্থায়ও স্তন্যপান করাতে পারেন। এমনকী মা অপুষ্টিতে ভুগলেও স্তন্যপান করাতে বাধা নেই।

৬) হিংসার থেকে সুরক্ষা শিশুদের অধিকার। সরকার, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংগঠন, সমাজ ও পরিবারকে এ বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে।

৭) বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে থাকলে শিশুরা সুরক্ষিত বোধ করে। কোনও কারণে বিচ্ছেদ হলে শিশুকে সেই পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এতেই শিশুর মঙ্গল।

৮) সশস্ত্র সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ শিশুদের ভীত ও রাগী করে তুলতে পারে। এ সময়ে তাদের বেশি করে স্নেহ ও বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। যতটা সম্ভব তাদের সুরক্ষিত রাখতে হবে। দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে হবে। বয়স উপযোগী সুযোগও করে দিতে হবে।

৯) জরুরি অবস্থার সময়েও শিশুর শিক্ষার অধিকার থাকে। এ সময়ে তাদের সুরক্ষিত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে হবে।

১০) ল্যান্ডমাইন ও পড়ে থাকা বোমা শিশুর পক্ষে বিপজ্জনক। পরিবারের সঙ্গে সুরক্ষিত জায়গায় শিশুদের রাখতে হবে। শিশুদের কোনও অচেনা জিনিস নিয়ে খেলা করতে দেওয়া যাবে না।